Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্মৃতি আক্তার

রোলঃ 227021571

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্মৃতি আক্তার

রোলঃ 227021571

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ উত্তম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্মৃতি আক্তার, আইডিঃ 227021571 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেকুলারিজম নাকি শরিয়াহ উত্তম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

স্মৃতি আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

স্মৃতি আক্তার

আইডিঃ 227021571

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সেক্যুলারিজম কি 6

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব: 8

আরব ও ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা: 11

সেক্যুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী: 13

সেক্যুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য ? 14

সেক্যুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড় 15

সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষতা না;বরং ভিন্নমতের দমনঃ 16

শূন্যগর্ভ সেক্যুলারিজম 19

রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা 20

ক্যারিয়ারে সেক্যুলার: 23

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা 23

টলারেন্সের ইসলামীকরণ 27

ইসলামি শরিয়াহর উৎস: 31

ইসলামি শরিয়াহ ও মানবীয় আইনের মধ্যে পার্থক্য: 33

ইসলাম কেনো সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রত্যাখ্যান করে? 35

উপসংহার: 36

রেফারেন্স: 36

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও বাদশাহ। যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়াময় এবং সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

মডার্নিটি (আধুনিকতা) মানবজাতির জন্য এবং ইসলামের জন্য হুমকি। কিন্তু মর্ডানিটির এ বিপদকে বুঝতে হলে আমাদের কিছুটা পিছনে যেতে হবে। ঐতিহাসিকদের মতে মর্ডানিটির শুরু ষোড়শ শতাব্দীতে। এই শতাব্দী ছিল ইউরোপের ইতিহাসে তীব্র উত্থান-পতনের সময়। রিফর্মেশনের মাধ্যমে এ শতাব্দীর শুরু হয় খ্রিষ্টানদের নিজেদের মধ্যেকার তিক্ত সংঘাত, যার ফলস্বরূপ জন্ম নেয় সেকুলারিজম। অপরদিকে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামকে আল কুরআনে বলা হয়েছে ‘দ্বীন’।

اِنَّ الدِّيْنَ عِندَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

অর্থ:নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দীন হলো ইসলাম। (সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯)

اَلْيَومَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ:আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দীন, তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম আমার অনুগ্রহ এবং তোমাদের জন্যে দীন মনোনীত করলাম ইসলামকে। (সুরা মায়িদা:আয়াত ৩)

দীন মানে-সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা, জীবন-বিধান; আনুগত্যের বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি। দীনের মধ্যেই আল্লাহ শরিয়া দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে তাঁর আনুগত্য করার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান প্রদান করেছেন। আদেশ নিষেধ জারি করেছেন। অনেক বিষয় বৈধ ও হালাল করেছেন, আবার কিছু কিছু জিনিস হারাম ও অবৈধ করেছেন। অনেক ব্যাপারে সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই বিষয় হলো শরিয়া।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন পালনে যেসব আইন-বিধান, নিয়ম পদ্ধতি, হালাল-হারাম, সময় সীমা এবং বৈধ অবৈধের সীমারেখা প্রদান করেছেন সেগুলো এবং সেগুলোর মূলনীতির সমন্বিত রূপই ইসলামি শরিয়া। শরিয়া একটি পরিভাষা। শরিয়া মানেই কুরআন -সুন্নাহর আইন ও বিধান।

সেক্যুলারিজম কি

Secularism শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা। তবে বাংলা ভাষায় শব্দটির অনুবাদ তা না করে করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা। বস্তুত এ মতবাদটি ধর্মকে এড়িয়ে নিছক বস্তবাদী স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মানববিদ্যা ও বুদ্ধির ভিত্তিতে মানবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে বুঝানো হয়-ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এ মতবাদটি ১৭শত শতাব্দীতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটি প্রাচ্যে প্রসারিত হয়। প্রথমদিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান, লেবানন, সিরিয়াতে প্রসার লাভ করে। ধীরে ধীরে তিউনিশিয়াতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষদিকে ইরাকে প্রসারিত হয়। এছাড়া বিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

আরব বিশ্বে এই মতবাদকে বুঝাতে লা-দ্বীনিয়্যাহ(لا دينية) বা 'ধর্মহীনতা' বলার কথা থাকলেও এ মতবাদের প্রবর্তক রাজ্যের সে শব্দটির পরিবর্তে ইলমানিয়্যাহ্ (علمانية) বা 'বিজ্ঞানময়' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে কারও কারও মনে হতে পারে যে শব্দটি বোধহয় 'ইলম'তথা 'জ্ঞান' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত বিষয়টি এরকম নয়। এ মতবাদের সাথে বিজ্ঞান বা Science এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা এ শব্দটি ব্যবহারে বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করে;কারণ শব্দটিকে জ্ঞানের দিকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারলে আরব সমাজে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তাই এ বিভ্রান্তির নিরসানার্থে শব্দটি কে আরবীতে 'ইলমানিয়্যাহ্' উচ্চারণ না করে 'আলামানিয়্যাহ' বলা উচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে, এ মতবাদের উৎপত্তিস্থল তার জন্য Secularism শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা বা ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর একটি ভুল অনুবাদ করা হয়ে থাকে, আর বলা হয় যে, এর অর্থ, ধর্মনিরপেক্ষতা।

Secularism যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়ে থাকে, তার সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ধর্ম ব্যক্তির অন্তরের খাঁচায় বন্দি থাকবে। ধর্মের পরিধি ব্যক্তি ও তার উপাস্যের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মকে প্রকাশ করার কোনো সুযোগ থাকলে সেটা শুধুমাত্র উপাসনা তে এবং বিবাহ ও মৃত্যু সংক্রান্ত রসম-রেওয়াজে।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা রাখার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে খ্রিস্টান ধর্মের মিল রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে কায়সার (খ্রিস্টান সরকার প্রধানের উপাধি) এর হাতে, আর গির্জার ক্ষমতা থাকবে আল্লাহর হাতে।যীশুর নামে প্রচারিত বাণী “কায়সারের অধিকার কায়সারকে দাও এবং আল্লাহর অধিকার আল্লাহ কে দাও” থেকেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের দ্বিমুখী নীতির অনুমোদন করে না।মুসলিম নিজেও আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তার গোটা জীবনও আল্লাহর জন্য। কুরআনে কারীমে এসেছে “হে রাসূল! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য”। [সূরা আন'আম:১৬২]

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব:

- এই মতবাদটি প্রথমে ইউরোপে প্রসার লাভ করে। তারপর প্রাশ্চাত্যের উপনিবেশ শাসন ও কমিউনিজমের প্রভাব-প্রতিপত্তির সুবাদে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরের বেশকিছু পরিস্থিতি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও চিন্তাধারা বিকাশ ঘটায়। নিম্নে উল্লেখিত ক্রম ধারায় ঘটনাগুলো ঘটেছে:
- এক্লিপস, বৈরাগ্য বাদ, ঐশ্বরিক নৈশভোজ ,ক্ষমাপত্র বিক্রি ইত্যাদির আড়ালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ তাগুতী শক্তি,পেশাদার রাজনীতিবিদ ও সৈরাচারে পরিনত হয়েছিল।
- গির্জাগুলোর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান,মানুষের চিন্তাধারার উপর গির্জার একচ্ছত্র আধিপত্য, গির্জা কর্তৃক Inquisition কোর্ট গঠন করা এবং বিজ্ঞানীদেরকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্তকরণ। উদাহরণস্বরূপ:-

-কোপার্নিকাস (Copernicus) :১৫৪৩ সালে “আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের আবর্তন”নামক একটি বাই প্রকাশ করেন। গির্জা কর্তৃক বইটি নিষিদ্ধ করা হয়।

-গ্যালিলিও(Galileo): টেলিস্কোপ আবিষ্কার করার কারণে ৭০ বছর বয়সী এই বিজ্ঞানীর ওপর কঠোর নির্যাতন নেমে আসে।১৬৪২ সালে তিনি মারা যান।

-স্পিনোজা(Spinoza) :তিনি ইতিহাস সমালোচনার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর শেষ পরিনতি হয়েছিল তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

-জন লক(John Lock) :তিনি দাবী উত্থাপন করেছিলেন যে, স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে ঐশীবাণী বিপক্ষে বিবেকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

- বিবেকবুদ্ধি ও প্রকৃতি নীতির উদ্ভব:ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ বিবেকের মুক্তির দাবী তোলেন এবং প্রকৃতিকে উপাস্যের বিশেষণে বিশেষিত করার দাবি জানান।

ফরাসি বিপ্লব:গির্জা ও নতুন এ আন্দোলনের মাঝে দ্বন্দ্বের ফলে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের একটি সরকার গঠিত হয়। জনগণের শাসন নামে এটাই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। কেউ কেউ মনে করেন যে, ফ্রিমেশন (Freemasons) এর সদস্যরা গির্জা ও ফরাসি সরকারের ত্রুটিগুলোকে পুঁজি করে বিদ্রোহ ঘটায় এবং যতদূর সম্ভব তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়াস চালায়। এ বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠান গুলো হচ্ছে,

-জঁ-জাক রুশো(jean Jacques Rousseau)মৃত্যু ১৭৭৮ খ্রি:-Social Contract (সামাজিক চুক্তি, অনুবাদ:ননী মাধব চৌধুরী) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি ইঞ্জিলের মর্যাদায় ছিল।

-মনটাসকিউ(Montesquieu) এর রচিত গ্রন্থ The Spirit of Laws.

-ইহুদী ধর্মাবলম্বী স্পিনোজা (Spinoza)কে ধর্মনিরপেক্ষতার পথিকৃত মনে করা হয়।তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে জীবন ও আচার আচরণের পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর রচিত পুস্তিকা রয়েছে।

-প্রাকৃতিক আইনের প্রবক্তা ভলটেয়ার(Voltaire):তাঁর রচিত বই আছে "বিবেকের গন্ডিতে ধর্ম"(১৮০৪)।

-উইলিয়াম গডউইন (William Godwin) (১৭৯৩খ্রি:) তাঁর রচিত বই হচ্ছে political Justice (রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা)। এই গ্রন্থে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে তাঁর আহ্বান সুস্পষ্ট।

-মিরাবোঁ (Mirabeau) :যাঁকে ফরাসি বিপ্লবের প্রবক্তা, নেতা ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

- - বাস্তিল (Bastille) : ধ্বংস করার দাবি নিয়ে গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে তাদের শ্লোগান ছিল- "রুটি চাই" পরবর্তীতে এই শ্লোগান "স্বাধীনতা, সম অধিকার ও ভ্রাতৃত্ব" তে পরিনত হয়। এটি মূলত:ফ্রিমেশন এর শ্লোগান। তাদের আরেকটি শ্লোগান ছিল "পশ্চাৎমুখিতার পতন হোক"। এর দ্বারা তারা ধর্মের পতনকে উদ্দেশ্য করে। এই শ্লোগান দিয়ে ইহুদীরা একটা হট্টগোল বাধিয়ে দেয়, এর মাধ্যমে তারা রাষ্টের কর্ণধারদের সাথে তাদের দূরত্ব নির্মূল করার চেষ্টা করে এবং ধর্মীয় বিরোধ গুলো মিটিয়ে দেয়ার প্রয়াত চালায়। এভাবে ফরাসি বিপ্লব ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে খোদ ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপ ধারণ করে।
- ধর্মবিমুখ বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব:সেক্যুলারিজমের উদ্ভবের পেছনে বেশ কিছু ধর্মবিমুখ-ধর্মবিদ্বেষী মতবাদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করা হলো:
- বিবর্তনবাদ:১৮৫৯ সনে ডারউইন (Charles Darwin) এর বই The Origin of Species(প্রজাতির উৎপত্তি, অনুবাদক- অধ্যাপক ম. আখতারুজ্জামান)

প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন(Natural Selection) এবং বংশগতি তত্ত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন। মানুষের আসল পূর্বপুরুষ হিসেবে একটি অনুজীব কে চিহ্নিত করা হয়। যে অনুজীবটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর একটি বদ্ধ ডোবাতে ছিল। বিবর্তনের ফলে এটি এক পর্যায়ে বানর এবং শেষ পর্যায়ে মানুষে পরিবর্তিত হয়। বিবর্তনবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটায়। ইয়াহুদীরা সুকৌশলে এই মতবাদকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে।

- নিতশার(Nietzsche) দর্শনের উদ্ভব:দার্শনিক নিতশা দাবী করেন- ইশ্বরের মৃত্যু হয়েছে।মানুষ হচ্ছে সুপারম্যান।মানুষকে ইশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত।
- দুরখীম (ইয়াহূদী) এর দর্শন:তিনি সামষ্টিক বিবেক (Group mind) ত্বত্তের ভিত্তিতে মানুষদেরকে জন্তু ও বস্তু সত্তার সম্মিলিত রূপ বলে মত প্রকাশ করেন।
- ফ্লুয়িড(Freud) (ইয়াহূদী) এর দর্শন:তিনি বস্তুজগতের সবকিছুতে যৌন বাসনাকে মূল প্রেরণা মনে করেন এবং

তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ নিছক যৌনাকাঙ্ক্ষী প্রাণী।

- কার্ল মার্ক্স(Karl Marx) (ইয়াহূদী) এর দর্শন:তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন।মার্ক্স "অনিবার্য বিবর্তন" ত্বত্তে বিশ্বাস করতেন।তিনি কমিউনিজমের প্রচারক ও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।তিনি ধর্মকে জাতিসমূহের আফিম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
- জঁ-পল সার্ত্র্ (Jean-Paul Sartre) তাঁর Existentialism নামক গ্রন্থে ও কলিং উইলসন (Colin Wilson) তাঁর The Outsider নামক গ্রন্থে অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি আহবান জানান।

আরব ও ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা:

- **মিসর:** নেপোলিয়ন বোনা ফোর্ট এর আক্রমণের সাথে মিসরের ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আল-জিবরিতি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে(মিসরের উপর ফরাসি হামলা ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ শীর্ষক অংশে) এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ বহন করে। যদিও তিনি এ শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেননি। যিনি সর্বপ্রথম 'ইলমানিয়্যাহ্' বা সেক্যুলারিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন তিনি হচ্ছেন- কাতারের অধিবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইলিয়াস;১৮২৭ সালে প্রকাশিত আরবী-ফরাসি অভিধানে। খিদীভ(মিশরের শাসকদের উপাধি) ইসমাঈল ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের আইন মিসরে প্রবেশ করান। এই খিদীভ প্রাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অন্ধভক্ত ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল মিসর কে ইউরোপের একটি টুকরোতে পরিনত করবেন।
- **ভারত:**১৭৯১ সাল পর্যন্ত ভারতে ইসলামি আইন (শরিয়া) মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। এরপর ইংরেজদের প্ররোচনায় ক্রমান্বয়ে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।
- **আলজেরিয়া:**১৮৩০ সালে ফ্রান্স কর্তৃক উপনিবেশ শাসনের স্বীকার হওয়ার পর ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।
- **তিউনিশিয়া:**১৯০৬ সালে তিউনিশিয়াতে ফ্রান্সের আইন স্থান করে নেয়।
- **মরক্কো:**১৯১৩ সালে মরক্কোতে ফ্রান্সের আইন অনুপ্রবেশ করে।
- **তুরস্ক:** ইসলামি খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এবং মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পর তুরস্ক সেক্যুলারিজমের চাদর পরিগ্রহ করে। যদিও তার আগে থেকেই কিছু কিছু লক্ষণ ও কর্মকান্ড দেখা দিয়েছিল।
- **ইরাক ও সিরিয়া:**উসমানী খেলাফত আমলে ইরাক ও সিরিয়া থেকে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং ইংরেজ ও ফরাসিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
- **আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল:**দখলদার উপনিবেশী শক্তির পতনের পর আফ্রিকার অনেক দেশে খ্রিস্টান রাষ্ট্রপ্রধানেরা ক্ষমতা দখল নেয়।

- ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ স্যাকুলার রাষ্ট্র।
- **সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের প্রসার:**বার্থ পার্টি, সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী দল, ফেরাউনি মতবাদ, তুরানি মতবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ।
- **আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গ:** আহমাদ লুতফি সৈয়দ, ইসমাঈল মাযহার, কাসেম আমীন, ত্বাহি হোসাইন, আব্দুল আযিয ফাহমি, মিশেল আফলাক, আনতুন সাদাত, সূকর্ণ, সুহার্তু, নেহেরু, মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, জামাল আব্দুন নাসের, "রাজনীতিতে ধর্ম নেই;ধর্মে রাজনীতি নেই" এই শ্লোগানের প্রবক্তা আনোয়ার সাদাত, ড. ফুয়াদ যাকারিয়া, ড. ফারাজ ফৌদাহ প্রমুখ।

সেক্যুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী:

- কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে। তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখলেও আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে মানুষের জীবনের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করে না।
- নিছক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং বিবেক ও অভিজ্ঞতার শাসনাধীনে মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।
- আধ্যাত্মিক জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান তৈরী করা। তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নেতিবাচক মূল্যবোধ।
- ধর্মকে রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং নিরেট বস্তুবাদী ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করা।
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে pragmatism (সুবিধাবাদ) প্রতিষ্ঠা করা।
- শাসন, রাজনীতি ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীর সূত্র অনুসরণ করা।
- অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় ছড়িয়ে দেয়া এবং পারিবারিক ভিত ভেঙে দেয়া। যেহেতু পরিবার হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের প্রথম বীজ।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মিশনারী সংস্থাগুলোর অপচেষ্টায় আরব ও মুসলিম বিশ্বে প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসগুলো হচ্ছে-

-ইসলাম, কুরআন ও নবুয়তের মূলে আঘাত করা।

-এ দাবী করা যে, ইসলামের আবেদন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইসলাম কিছু আধ্যাত্মিক পূজ-অর্চনা ছাড়া কিছু নয়।

-এ দাবী করা যে, ইসলামী ফিকহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র রোমান আইন থেকে উদ্ভূত।

-এই দাবী তোলা যে, ইসলাম বর্তমান সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলাম মানুষকে পশ্চাৎমুখী হওয়ার আহবান জানায়।

_ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে নারীমুক্তির আহবান জানানো।

-ইসলামী সভ্যতাকে বিকৃতভাবে পেশ করা। ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক আন্দোলন গুলোকে সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে দাবী করা।

-প্রাচীন সভ্যতা গুলোকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করা।

-পাশ্চাত্যের ধর্মহীন আইন কানুন ও কারিকুলাম আমদানী করা এবং নিজেদের কর্মকান্ডে পাশ্চাত্যের ধারা চালু করা।

-নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা।

সেক্যুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য ?

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা বিকাশের কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। কেননা কোনো খ্রিস্টান কে যখন মানবরচিত সিভিল ল'দিয়ে শাসন করা হয় তখন সে অল্প বা বিস্তার বিরক্ত হয় না। কারণ এতে করে সে এমন কিছুকে অকেজো করছে না যা মান্য করা তার ধর্ম তার উপর আবশ্যক করে দিয়েছে;কেননা তাঁর ধর্মে জীবনবিধান হিসেবে কিছু নেই। কিন্তু মুসলিম ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলিমের ঈমানই তাকে আল্লাহর আইনের শাসন গ্রহণে বাধ্য করে। তাছাড়া-যেমন ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী বলেন-ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন রাখা হলেও খ্রিস্টান ধর্ম তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা তে অটুট থাকবে এবং খ্রিস্টান ধর্মরক্ষী পোপ, ফাদার, মাদার ও ধর্মপ্রচারক বিনা প্রতিবন্ধকতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসলিম দেশে যদি এ মতবাদ চালু করা হয় তাহলে ইসলাম শক্তিহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। কারণ ইসলাম কোনো ব্যক্তির জন্য পোপ, যাজক, এক্লিউরিস এর মত আধিপত্য অনুমোদন করে না।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রাঃ) ঠিকই বলেছেন- “আল্লাহ তায়ালা শাসককে দিয়ে যা বাস্তবায়ণ করান, কুরআন দিয়ে তা বাস্তবায়ণ করান না।

সেক্যুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড়

-প্রথমতঃ গির্জার সাথে শত্রুতা। দ্বিতীয়ত ধর্মের সাথে শত্রুতা, চাই সে ধর্ম বিজ্ঞানের পক্ষে অবস্থান নিক অথবা বিজ্ঞানের বিপক্ষে অবস্থান নিক।

-সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের বড় ভূমিকা রয়েছে;যাতে করে তারা এর মাধ্যমে তাদের ও বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যকার ধর্মীয় দেয়াল নির্মূল করতে পারে।

-আলফ্রেড ওয়াইট হু বলেন: "যে ইস্যুতেই ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে সেখানে বিজ্ঞানের অভিমতই সঠিক পাওয়া গেছে এবং ভুল সর্বদা ধর্মের মিত্র"।যদি এ উক্তিটি ইউরোপে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক হয়েও থাকে, ইসলামের ব্যাপারে এ বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত এবং কোনো বিবেচনায় সঠিক নয়। কারণ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত তত্ত্বগুলোর মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই। ইসলাম ও বাস্তব বিজ্ঞানের মাঝে কখনো কোনো বিরোধ বাঁধেনি, খ্রিস্টান ধর্মের সাথে যেরূপ বিরোধ বেঁধেছিল। একজন সাহাবী থেকে একটি উক্তি বর্ণিত আছে- "ইসলাম যা আদেশ দিয়েছে সে বিষয়ে বিবেক কখনো বলেনি যে, হায়! ইসলাম যদি এ ব্যাপারে নিষেধ করা হতো। অথবা ইসলাম যা থেকে বারণ করেছে সে বিষয়ে বিবেক কখনো বলেনি যে, হায়! ইসলাম যদি এ ব্যাপারে আদেশ দিতো"। বৈজ্ঞানিক বাস্তব তত্ত্ব-উপাত্তগুলো এ উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করে।পাশ্চাত্যের একদল বিজ্ঞানীও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন।তাঁদের মুখনিসৃত শত শত উক্তির মাধ্যমে ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁদের অনুরক্ততা ও এ বৈশিষ্ট্যের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে।

- "বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে শত্রুতা" এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপকতা প্রদান,যাতে এর আওতায় ইসলাম ও এসে যায়।অথচ ইসলাম গির্জার নেয় জীবন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি।বরং অভিজ্ঞতাবাদ পদ্ধতি (empirical method) প্রয়োগ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ইসলামই ছিল অগ্রণী।

-আখেরাতকে অস্বীকার করা এবং আখেরাতের জন্য আমল না করা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে, ভোগ ও উপভোগের জন্য দুনিয়ার জীবনই একক ক্ষেত্র।

সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষতা না;বরং ভিন্নমতের দমনঃ

বলা হয় সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষ। সেক্যুলার রাষ্ট্র নাকি সবার জন্য এক নিরপেক্ষ স্থান তৈরি করে। এ দাবি ভুল। সেক্যুলারিজমের কোনো সংস্করণই নিরপেক্ষ না। এ বিষয়ে অন্য কোনো আলোচনাতে যাবার আগে এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়া জরুরি। সেক্যুলারিজমের নিয়ে ২০১৫-তে লেখা এক প্রবন্ধে অ্যাংলিকান পাদরি জাইলস ফ্রেইযার লেখেন-

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত যুদ্ধ তুঙ্গে পৌঁছে। মুক্তি চিন্তার নামে শুরু হওয়া বিপ্লব ১৭৯৪ এর ইস্টার আসতে আসতে ফ্রান্সের ৪০,০০০ এর বেশি গির্জার বেশির ভাগ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়। শুরু হলো গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ক্রুশ আর পানপাত্র ভেঙে। শেষ হয় জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ আর গিলোটিনে পাথারি ও নানদের ঢালাও হত্যার মাধ্যমে। ইতিহাসে এ সময়টা পরিচিতি পায় 'ত্রাসের রাজত্ব'(Reign of Terror) নামে।

'টেরোরিজম'(সন্ত্রসবাদ) বলে যে শব্দটা আজ আমরা ব্যবহার করি, সেক্যুলার ফরাসী বিপ্লবের সময়টাতেই ফ্রেঞ্চ 'terrorisme' শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। ফরাসী বিপ্লবের রথীমহারথীদের অন্যতম ম্যাক্সেমিলিয়ান রবসপিয়ের এ সময় ঘোষণা করে, সন্ত্রাস হলো তাৎক্ষণিক, তীব্র এবং অনমনীয় বিচার। সন্ত্রাস হলো শুদ্ধির বিচ্ছুরণ আজ যাদের জঙ্গী কিংবা সন্ত্রাসী বলা হয় তাদের কাছ থেকেও এ ধরনের কথা শোনা যায় না। যেসব খ্রিস্টান তাদের শতাব্দীর পুরোনো বিশ্বাস আঁকড়ে রেখেছিল, তাদের ম্যাসাকার করা হয় 'ভেন্ডি'তে(Vendée) । ঐতিহাসিক মার্ক লেভিনের মতে এ ছিল, 'আধুনিক গণহত্যার পূর্বসূরি'।

ফ্রান্সের এ নিয়মতান্ত্রিক বি-খ্রিষ্টকরণ কোনো অর্থেই এক 'কট্টর ধর্মের স্বাভাবিক পতন' ছিল না। এটা এনলাইটেনমেন্ট রযাশনালিটির স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক উত্থান ও ছিল না;বরং এ ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় খুনে দমন পীড়নের ফলাফল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মধ্যযুগের ধর্মরাষ্ট্র বা থিওক্রেসির সমালোচনা করে মুখে ফেনা তোলে। এমন রাষ্ট্র কে তারা খারাপ বলে, কারণ এখানে নৈতিকতার নির্দিষ্ট কোনো ধ্যানধারণা জোর করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো। অথচ সেক্যুলার রাষ্ট্র ঠিক এই কাজটা করে।

২০১৭ সালে বেলজিয়ামের ওয়ালুন প্রদেশে রীতিমতো ভোট দিয়ে হালাল এবং খোলার মাংস নিষিদ্ধ করা হয়। এখন থেকে আর জবাই করা পশুর মাংস বিক্রি করা যাবে না। বিক্রি করতে গেলে পশুকে ইলেকট্রনিক শক দিয়ে হত্যা করতে হবে। এখন পর্যন্ত ইউরোপের সাতটি দেশে একইভাবে হালাল এবং খোলার পদ্ধতিতে পশু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে–নরওয়ে, ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রিয়া, আইসল্যান্ড এবং বেলজিয়াম।

এর যৌক্তিকতা কী? সেক্যুলার রাষ্ট্র এই অবস্থা কে কিভাবে ব্যাখ্যা করে?

তারা বলে, পশুকে ইলেকট্রনিক শক না দিয়ে হত্যা করা অমানবিক। ইলেকট্রনিক শকের বদলে অন্য কোনো ভাবে হত্যা করলে পশু কষ্ট পেয়ে মারা যায়। তাই ইলেকট্রনিক শকের বদলে জবাই করা নিষিদ্ধ। এই হলো সেক্যুলার ইউরোপের যুক্তি। এই দাবির ভিত্তি কি? কোনো প্রাণী কি এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে? কোনো গরু বা ছাগল কি কোর্টে এসে বলেছে--প্লিজ, আমাদের ইলেক্টিক শক দিয়ে মারুন, অন্যভাবে মারলে ব্যথা বেশি লাগে! পুরো ব্যাপারটাই ধারণাপ্রসূত। বোল্ট ব্ল্যাস্ট দিয়ে খুলি ফুটো করা কিংবা ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা করা হলে ব্যথা কম লাগে– এএই তথ্য তারা কোথা থেকে পেল? কিসের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানা হলো তা আদৌ স্পষ্ট নয়;বরং সাধারণ বিবেক বুদ্ধি বলে বোল্ট ব্ল্যাস্ট কিংবা ইলেকট্রিক শকে মৃত্যুর চেয়ে জবাই করে মৃত্যু কম কষ্টকর হবার কথা। যদিও বিষয়টা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় আমাদের নেই। তবু ঠুনকো যুক্তির উপর ভিত্তি করে এই দেশগুলো জবাই নিষিদ্ধ করেছে। তাদের কাছে যেটা নৈতিক আর মানবিক মনে হয়েছে, সেটা তারা আইন বানিয়ে নিয়েছে। তারপর রাষ্ট্রের শক্তিবলে অন্যদের ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছে। আইন আসলে এইভাবেই তৈরি হয়। সেক্যুলার কিংবা ধর্মভিত্তিক– দুই ধরনের রাষ্ট্রেই এভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আইন পাশ করলে পশ্চিমা বিশ্ব সেটার সমালোচনায় উঠেপড়ে লেগে যায়। তখন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়। চিৎকার করে বলে– ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হলো বর্বর, এটা মধ্যযুগীয় ধর্মীরাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু লিবারেল বস্তুবাদী বিশ্বাস অনুযায়ী আইন তৈরি করা ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ!

কী নির্লজ্জ প্রতারণা!

বেলজিয়ামসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর এ ধরনের আইনগুলোকে বর্ণবাদী,ইসলামবিদ্বেষী,সাম্প্রদায়িক,ইত্যাদি বলা আসলে কার্যকরী না।যদিও এসব

আইনের পেছনে তাদের ইসলাম বিদ্বেষের ভূমিকা আছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু এগুলোকে বর্ণবাদী বা ইসলামবিদ্বেষী বলা কার্যকারী না, কারণ সেক্যুলার আইনপ্রণেতা তখন বলবে ‘আমরা তো যথাসম্ভব ক্ষতি কমানোর উদ্দেশ্যে আইন বানাচ্ছি, বৈষম্য কিংবা বিদ্বেষের কারণে না।

এ ধরনের আইনের বিরুদ্ধে কার্যকরী আরগুমেন্ট হবে অনেকটা এ রকম:

বেলজিয়ানরা আইন বানিয়েছে ভালোমন্দের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী। এদিক থেকে তাদের দোষ দেয়া যায় না। তবে নৈতিকতার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস গুলোর সমালোচনা করা যায়। আমরা তাদের বলি– এএ ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান ভুল, আমাদের অবস্থান সঠিক। কারণ, আমাদের বিশ্বাস হলো গরু, ছাগল, মানুষসহ সব পশুপাখির সৃষ্টিকর্তা, মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওহি। আর তোমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হলো কিছু ফাঁপা বুলি।

এই ধরনের যুক্তির মাধ্যমে যথাযথভাবে তাদের অবস্থানের মোকাবিলা করা যায় এবং কার্যকরী ডায়ালেকটিক তৈরি করা যায়। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে এধরনের আলোচনা তেমন একটা দেখা যায় না।

শূন্যগর্ভ সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজম সব সময় মাধ্যমের কথা বলে, কিন্তু গন্তব্যের আলোচনা করতে হলে ধর্মকে লাগবে। সেক্যুলারিজম আপনাকে কোনো কাজের গুরুত্বের কথা বলবে, কিন্তু কাজের ফলাফলের ব্যাপারে বলবে না। অস্পষ্ট কিছু দাবি ছাড়া আর কিছু তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ফলাফলের আলোচনা করতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

সেক্যুলারিজম আপনাকে ভোট দিতে বলবে। কিন্তু কোনো নৈতিকতা আর মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভোট দিতে হবে, সেটা বলবে না। কারণ, সেটা ধর্মের জায়গা, সেক্যুলারিজম বলবে সবাইকে সমানভাবে সম্মান করতে। কিন্তু সম্মান যোগ্য হবার অর্থ কী, সেটা বলবে না। কারণ সম্মান ও মর্যাদার কেন্দ্রকে বুঝতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

অনেকে ভাবতে পারেন এর অর্থ হলো মানুষ যত সেক্যুলার হবে তত নিরপেক্ষ হবে। এটা ভুল ধারণা। মানুষের মন-মস্তিস্ক কখনো খালি থাকে না। লিবারেল সেক্যুলারিজম যে শূন্যতা তৈরি করে কিছু না কিছু দিয়ে সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে আজ এই শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে বহু জাগতিক কর্পোরেশন আর অশ্লীলতা ও বিকৃতির প্রচারে সদা প্রস্তুত মুনাফালোভী মিডিয়ার বানানো চটুল সাংস্কৃতিক আবর্জনা দিয়ে। একসময় এটাই হয়ে দাড়াচ্ছে জনগণের ধর্ম। মানুষের পরিচয় আর চরিত্রের কাঠামো। এটাই সেক্যুলারিজমের অবধারিত ফল এবং উদ্দেশ্য। এভাবে সেক্যুলারিজম মানুষকে পরিণত করে ক্ষমতার অনুগত গোলামে। এই বিষের প্রতিষেধক কী?

ইন্নামাল আমালু বিননিয়্যাতি

প্রতিষেধক হলো প্রতিনিয়ত নিজের কাজগুলোকে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা। নিজের গন্তব্য ও পরিণতির প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা। আর এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল তিনিই দিতে পারেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই নিজের অন্তর খুঁড়ে খুঁড়ে ভোগবাদী লিবারেল-সেক্যুলার সংস্কৃতির আবর্জনা গুলো দূর করুন । আর নিজেকে যুক্ত করুন চিরন্তন সত্য পথের সাথে।

রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা

খুব খারাপ শোনাবে কথাগুলো।কসম আল্লাহর,আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে আমাদের জীবন থেকে বের করে দিয়েছি। আল্লাহ বলেছেন– ললিল্লাহি মুলতুবি সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) করে ছেড়েছি। আমি সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে দাওয়াহর নিয়তে নসিহত করছি। আপনারা তাওবা করুন, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করুন। কার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন? কাকে বাদ দিয়ে দেশ চালাচ্ছেন? কাকে বাদ দিয়ে সংবিধান করছেন? ইউরোপীয়দের পাল্লায় পড়ে আল্লাহর সাথে অনেক লড়েছেন, আর নয়। এবার ক্ষান্ত দিন।

- 'আল্লাহ উপর বিশ্বাস' – এর কোনো জায়গা আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে নেই। কোনো পলিসিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রাখা হয় না। আল্লাহ এই পলিসিতে কী করতে বলেছেন, তা বলার মতো লোক আপনাদের পলিসি লেভেলে থাকে না। একজন নামেমাত্র সংবিধান ঢুকিয়েছিল, সেই নামেমাত্র 'আল্লাহর নামটুকু সংবিধানে থাকবে', তাও আমাদের সহ্য হয়নি। দলাদলি আর দলীয় অন্ধত্ব এই পর্যায়ে গেছে, আল্লাহর নাম... কার নাম? 'আল্লাহর নাম' আমরা বের করে দিয়েছি।
- কাফিরদের সন্তুষ্টি পেতে, কাফিরদের দেওয়া উন্নয়নসূচকে স্থান পেতে আমরা নারী নীতি করি কাফিরদের মতো করে। আল্লাহ ও রাসুল কী বললেন, তার সেখানে জায়গা নেই।
- অসাম্প্রদায়িকতার নামে শিক্ষানীতি করি বিধর্মী-স্তুতি দিয়ে, যা আল্লাহ ও রাসুল থেকে নিয়ে যায় দূরে বহু দূরে। খোদ পশ্চিমা একাডেমিয়ায় যেগুলো এখনো বিতর্কিত, সেগুলোকে (নারীবাদ, মানবতাবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি কুফরকে) ধ্রুবসত্য ও আধুনিকতার স্কেল হিসেবে শেখাই আমাদের সন্তানদের।
- এমনি করে আইনসভায় আইন করার সময় আল্লাহ ও রাসুলের কথার কোনো স্থান নেই। মদ ও পতিতার লাইসেন্স দেবার সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা নেই।

- অর্থ ব্যবস্থায় 'আল্লাহ যে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন' তার কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমাদের কোনো ভয় নেই।
- পরিবার পরিকল্পনা নামে আমরা একটা মন্ত্রণালয়ই বানিয়ে নিয়েছি যাদের কাজ 'আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা'(টিউবেকটোমি ও ভ্যাসেকটোমি)।
- দন্ডবিধিতে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রাখিনি। আল্লাহ আর তাঁর রাসুল এই যুগে 'অচল'? কুরআনে নানা জায়গায় বিধান- আইন বলে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন: 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারণ। আর(যারা এটা অস্বীকার করবে,সেই) কাফিরদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।
- মহারাজাধিরাজ আল্লাহর বেঁধে দেওয়া দন্ডকে 'অমানবিক'বলছি, 'এ যুগে অচল'বলছি। কত বড় সাহস আমাদের! এত বড় সাহস গত ১৪০০ বছর মুসলিমরা কখনো দেখায়নি। নামেমাত্র যেটুকু 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস' রাষ্ট্রনীতিতে কথার কথা হিসেবে ছিল, নাস্তিক-বাম মুরতাদ বুদ্ধিজীবী আর কাফির প্রতিবেশীকে পাশে পেতে সেটুকুও আমরা খেদিয়েছি। মুখে মুসলিম দাবি করে এত বড় স্পর্ধা আমাদের। আল্লাহকে বের করে দেওয়ার স্পর্ধা। আল্লাহর সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা না করার দম্ভ আর ঔদ্ধত্য আমাদের। সীমা বেঁধে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন 'খবরদার, এটুকু আমার সীমা, এই সীমা লঙ্ঘন করবে না। আর আমার দম্ভের সাথে ঘোষণা করছি 'আল্লাহর সীমা মানি না',

'আমরা ধর্মনিরপেক্ষ,'মানে রাষ্ট্র চলবে ইউরোপীয় কায়দায়, এখানে আল্লাহর মতামতের মূল্য নেই। এগুলো কাফিরদের মুখে মানায়, একেকজন মুসলিম আমরা এই ঘোষণা দিচ্ছি আজ।

মধ্যযুগে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি, আইনের শাসন, নিত্যনতুন ভূখণ্ডে মাজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান ইত্যাদির অনন্য নজির তৈরি করছিল। ঠিক তখন মধ্যযুগে পোপ-যাজকদের সমর্থিত জমিদার ও রাজতন্ত্র ইউরোপের জনজীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ধর্মীয় দলাদলি, যুদ্ধ, মানব-রচিত বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথায় অতিষ্ঠ ইউরোপ মুক্তি চাইল। ইউরোপের দার্শনিকরা জমিদারতন্ত্রকে উৎখাত করে গনতন্ত্র আর খ্রিষ্টীয় যাজকতন্ত্রকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কথা বলল। নতুন এই রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। দুই অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই পেক্ষাপট।

একদিকে ওহি ভিত্তিক শাসনের ফলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। আরেকদিকে মানব-রচিত ধর্মের কারণে স্বার্থান্বেষী যাজক শ্রেণি সমর্থিত শাসনের ফলে অন্যায়ের সয়লাব। দুটো দুই জিনিস।

ইউরোপ তাদের ‘এনলাইটেনমেন্ট’-এ এসে সোকল্ড আলোকিত হয়েছে। আর আমরা তো আলোকিতই ছিলাম। আমাদের হিদায়াতের নূর তো সেই ৭ম শতকেই এসে গেছে।

ক্যারিয়ারে সেক্যুলার:

আমরা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছি গত ১০০ বছর। নিজের মতামত, ভোট, মেধা, অস্ত্র, শ্রম দিয়ে আল্লাহর সাথে স্পর্ধাকারী সিস্টেমকে সমর্থন দিয়েছি। আমরা মনে করছি, বিশ্বাস করেছি ‘রাজনীতিতে আল্লাহর কোনো জায়গা নেই’। এই আপ্তবাক্যকে আউড়িয়েছি, শিখিয়েছি, দম্ভভরে ঘোষণা করেছি, ‘আল্লাহ’মুক্ত রাজনীতি করছি, দারিদ্রতার ভয়ে সুদে লোন নিচ্ছি, ব্যবসা করবো, আমাদের আজ প্রচুর টাকা দরকার, সমাজে সম্মান দরকার, উঁচু পদ দরকার। যেকোনো মূল্যে, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে। প্রয়োজনে আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়ে, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে, আল্লাহ-বিরোধী এই সিস্টেমটার প্রহরী হয়ে। অথচ আমি দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো মূল্যে আল্লাহ কে খুশি করা, যেকোনো কিছুর বিপরীতে আল্লাহর দাসত্ব করা।
‘আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।’(সুরা যারিয়াত) ।

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অর্থ হলো ধর্মীয় নির্দেশনা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকা। ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তির জীবনাচারের পরিধি নিজ সত্তা পেরিয়ে সন্তান, বউ, মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না;সমষ্টিগত জীবন হয়ে যায়। এই সীমা অতিক্রম করলেই ব্যক্তির উপর হিউম্যান রাইটস-এর বিধান প্রয়োগ হওয়া শুরু করে। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের বিষয়েও কোনো প্রকার হিউম্যানিজমবিরোধী হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। বাস্তবতা হলো, সেক্যুলারিজম ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে। কারণ, সেক্যুলারিজম এর মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়। এটা গৌণ বিষয়। সেক্যুলারিজম মূল উপাদান হলো আল্লাহ এবং দীনের প্রভাব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। ধর্মীয় প্রভাব অস্বীকারের ব্যাপারটি জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। মুসলিমদের অনেকেই নিজেদের প্রফেশনাল লাইফকে দীনের প্রভাব থেকে মুক্ত মনে করে। ফলে দেখা যায় কোনো কাজকে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা সত্তাগতভাবে হারাম মনে করলেও পেশা হিসেবে বৈধ মনে করছে। এটা মুসলিম জীবনে

সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটার সহ অনেক হারাম ক্যারিয়ারিস্ট মুসলিম ব্যক্তি-জীবনে নামাজ-রোজা পালন করছে;কিন্তু পেশা হিসেবে সুস্পষ্ট হারাম কাজগুলো বৈধ মনে করছে। এমন আচরণ সেক্যুলারিজমেরই প্রভাব। আবার এই অস্বীকৃতি একান্ত ব্যক্তি-জীবনেও হতে পারে। ব্যক্তির চিন্তা ও মনন থেকে যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের ধারণা হারিয়ে যায়, ধর্মের প্রভাব প্রত্যাখ্যাত হয় তবে তা সেক্যুলারিজমেরই অংশ। ধর্মীয় বিধানবলিকে নিছক ওহির টেক্সট থেকে গ্রহণ না করে নিজস্ব আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে গ্রহণ করার মতো ব্যক্তিগত প্রবনতা ধর্মীয় কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করারই ভিন্ন চিত্র। এজন্য কেউ নিয়মিত কিছু ধর্মীয় আচার পালন করেও ধর্মীয় কর্তৃত্বের জায়গায় অস্বীকারকারী হতে পারে। মুসলিম সমাজে এমন লোকের অভাব নেই বর্তমানে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কেবল রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং সমাজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি-জীবনে হস্তক্ষেপ করাও এর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কেউ সেগুলোর অনুসরণ করতে পারবে না।এখন প্রশ্ন হলো,এভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানরা কার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় সহ সর্বত্র কার বিধান চলবে?

এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ফলে ইসলাম তার অনুসারীদের সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো ক্ষেত্রে এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে ইসলাম তাকে নিজ অনুসারীদের কাতারে জায়গা দেয় না। নবীগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল উলুহিয়্যাত, উবুদিয়্যাত। কারণ আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বিশ্ব পরিচালনাকারী সত্তা হিসেবে স্বীকার করত;কিন্তু তাকে একমাত্র মামুদ ও হাকিম হিসেবে মানত না। আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত অস্বীকার করত। আর সেক্যুলারিজমের মূল কাঠামোই 'আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করা', যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাত বলেছেন। আল্লাহর হাকিমিয়্যাত কে বাদ দিয়ে জাহিলিয়্যাত গ্রহণ করাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুফর এবং শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হেদায়েত ও শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেট গ্রহণকারী উম্মাহর মহান সালাফ ও পূর্ববর্তী ইমামগণ এবং বর্তমান আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'ফাসলুদ দীন খনিজ দাওলাহ আও আনিস সিয়াসাহ' তথা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা সুস্পষ্ট কুফুর।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন-

“ তারা কি জাহিলিয়্যাতের শাসনব্যবস্থা কামনা করে!বিশ্বাস সম্প্রদায়ের জন্য শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে আছে?”

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন,যে আল্লাহর অকাট্য বিধান ছেড়ে দেয়; অথচ তা সকল কল্যাণ সমন্বিত করে,সকল ক্ষতিকারক বস্তু নিষিদ্ধ করে।আল্লাহর বিধান ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে যায় এমন মতামত, রীতি ও প্রথার দিক, যা প্রণয়ন করেছে মানুষ,আল্লাহর শরিয়তের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই,যেমনটা করতে জাহেলি যুগের মানুষেরা।তারা তাদের চিন্তাপ্রসূত মত থেকে প্রণীত জাহলি ভ্রান্ত বিধান দ্বারা ফয়সালা প্রদান করত। যেমন,তাতাররা তাদের সেসব রাষ্ট্রীয় আইনকানুন দিয়ে বিচার ফয়সালা করেছে, যা তারা গ্রহণ করেছে তাদের বাদশাহ চেঙ্গিস খান থেকে। চেঙ্গিস খান তাদের জন্য ‘ইয়াসিক’নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হলো ইসলামী, নাসরানি,ইহুদিসহ বিভিন্ন শরিয়তের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যা সে শুধু নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। তারপর তা তার অনুসারীদের নিকট পরিনত হয়েছে অনুসরণীয় সংবিধান রূপে। একে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করার উপর অগ্রাধিকার দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং কমবেশি যাই হোক, যেকোনো ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু কে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ না করা”। (তাফসির ইবনে কাসির,৩:১৩১)

আল্লামা মুস্তফা সাফারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা আর দীন ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ- এই দুই বিশ্বাস কখনো এক হতে পারে না।’(মাওকিফুল আকল-২৮০)

তিনি আরও বলেন, ‘কোনো মুসলমান যদি তার সাধারণ সামাজিক জীবনে দীনের এই কর্তৃত্ব মেনে না নেয় যে,দীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলির উপর দখল দেবে,তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কিভাবে খারিজ হবে না,যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কর্তৃত্ব এবং এই দখলদারত্ব মেনে না নেবে!’(মাওকিফুল আকল ৪:২৯৪)

আল্লামা জাহেদ কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফুর। (মালাকাতুল কাউসারি,হুকুম মুহাওয়ালাতি ফাইলিং দীন:৩৩০-৩৩১)
শাইখ সালেহ আল ফাওজান রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার মতাদর্শ গ্রহণ করবে সে কাফের।
বাংলাদেশের উচ্চতর ইসলামী আইন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকার মুদির মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ তার এক বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের ভিত্তি হলো আল্লাহর কালাম কুরআন মজিদ।
তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতার দাবি হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, যা স্পষ্টতই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি। (মাসিক আলকাউসার,ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৪)
সংজ্ঞাগতভাবে সেক্যুলারিজমের দ্বিতীয় দিক হলো সকল মতের প্রতি উদার ও নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার যেই মাপকাঠি গ্রহণ করবে, তা মেনে নেওয়া। অন্যভাবে বললে, টলারেন্স- এর উদ্দেশ্য হলো, ভিন্নমতকে গুরুত্বহীন এবং অনর্থক মনে করা। স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার দাবি হলো, কেউ নিজের কল্যাণের ধারণার ভিত্তিতে অন্যকারো সমালোচনা করার কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি একজন পিতা তার সন্তানকেও নামাজ পড়ার জন্য জোরজবরদস্তি করতে পারবে না। জীবন পরিচালনার প্রতিটি পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমানভাবে মেনে নেওয়ার নাম টলারেন্স।যখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খায়েশ পূরণ এবং জীবন পরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি ও ধারণা সমান মর্যাদার,তখন প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো অন্যের খায়েশ ও প্রবৃত্তি মেনে নেওয়া এবং তাকে সম্মান করা।

টলারেন্সের ইসলামীকরণ

কুরআনুল কারিমের বহুল ব্যবহৃত একটি আয়াত-

لَآاِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা,আয়াত ২৫৬)

কুরআনের এই আয়াত ব্যবহার করে অনেকে টলারেন্সের দর্শন কে ইসলামি দর্শন প্রমাণ করতে চায়। ব্যাপক অর্থে তারা বুঝাতে চায় যে দীনের যেকোনো ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করা নিষেধ। এটা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। কারণ এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের সকল বিধান অনর্থক হয়ে পড়ে। এখন যদি দুজন নারী পুরুষ মিলেমিশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ায় এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তা হলে ইসলাম তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করতে পারে না। কারণ এটি তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এভাবে সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে, যদি আয়াতের এমন ব্যাপক অর্থ নেওয়া হয়। তা ছাড়া কোনো মুফাসসির এমন তাফসির করেননি। আয়াতের অর্থ হলো, কোনো মানুষের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করানোর ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। এই ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি অর্থহীন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের উপর ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য, তা তার উপর যথাযথভাবে প্রয়োগ হবে।

মূলত ইসলামে সব ধরনের জবরদস্তি নিষিদ্ধ নয়। বরং যেই জবরদস্তি শরিয়তে নেই, তাকেই কেবল ইসলাম নাকচ করে। আল্লামা শাতেলিয়ার রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে সেই ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য, যে শরিয়ত বহির্ভূত পন্থায় জবরদস্তি করে। যেমন, কেউ কোনো পুরুষকে চাপ দিলো তার স্ত্রী কে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে (এটি নিষিদ্ধ) । তবে যখন শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায় জবরদস্তি করা হবে তা অবশ্যই গ্রাহ্য হবে। যেমন, কোনো কাফের তরবারির ছায়ায় ইসলাম কবুল করল। (আল ই’তিসাম-৩৭০)

সুতরাং ইসলামে নিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার বলতে কিছু নেই। বরং ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে। শরিয়ত প্রদত্ত অধিকারকেই বাস্তবায়িত করে। ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। এটাই ইসলামের পরিচয়। শান্তি, নিরাপত্তা, সমতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিয়ে ইসলামকে জাস্টিফাই করার অধিকার কারো নেই। কারণ ইসলাম এগুলো দাবি করে না। ইসলামে নিরপেক্ষতা কিংবা সমতা থাকলে ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি কুফর প্রচারের ও অনুমোদন থাকত। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র

কখনোই কুফুর প্রচারের অনুমতি দেয় না। সম্পূর্ণরূপে কুফরের প্রচার প্রসার নিষিদ্ধ করে। জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যারা জিম্মি হবে, তাদেরকে ইসলাম নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। তবে ব্যাপারটা এতো ব্যাপক না এবং ইসলামের মতো সমান অধিকার ও না সেটা। নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও সীমাবদ্ধতা জারি করার মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় সুবিধা পাবে। এখনকার মতো অলিগলিতে শিরক ও কুফুরের জৌলুস, পরিবেশ ভারি করা আয়োজন, নির্লজ্জ ও অশ্লীল মহড়া এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শন অনুমোদন তারা পাবে না। এগুলো ইসলামসমর্থিত অধিকার নয়। জিম্মিদের বিধান নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। ফিকহের প্রতিটি গ্রন্থে উম্মতের ফকিহগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মোটাদাগে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো,

১। জিজায়া প্রদান ব্যতীত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার পাবেনা।

২। নতুন কোনো উপসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না। (যদি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি থাকে তবে ভিন্ন কথা।)

৩। নিজেদের ধর্মের প্রচার চালাতে পারবে না মুসলিমদের মাঝে।

৪। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে তারা নিয়োগ পাবে না।

এই ধরনের কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে, যেগুলো সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বর্তমান সেক্যুলার অধিকার ইসলাম দেয় না। ইসলাম তাদের যতটুকু অধিকার দেয়, তাই ন্যায্য। আমরা মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে আজকাল এসব বিষয়ে কাটছাঁট করে থাকি।

ইতোপূর্বে সেকুলারিজম যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, পরিণামের দিক থেকে সংজ্ঞাটা প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। কারণ প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলারিজম যদিও রাষ্ট্র থেকে আসমানি ধর্মকে পৃথক করে তবে ব্যক্তিগত বিষয়ে বলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে আত্মপূজারি আরেকটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম। এই ধর্মের প্রভু হলো মানুষ এবং জ্ঞানের উৎস হলো আকল। সেক্যুলারিজম নিজেই একটি ধর্মীয় অথরিটি সংরক্ষণ করে। সে অন্যান্য ধর্মের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।সকল ধর্মীয় অনুশাসনকে সে নিজস্ব মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করে।সে যদিও মুখে বলে যে সব ধর্ম তার স্বাধীনতা পাবে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেক্যুলারিজম একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে তার ধর্মে ঘোষিত হালাল কে গ্রহণ করতে এবং হারাম কে বর্জন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে।তার নিজস্ব হালাল-হারাম তথা বৈধতা-অবৈধতার ধারণা রয়েছে।সেই

ধারণার ভিত্তিতেই সে প্রতিটি বিষয়ের অনুমদন দিয়ে থাকে। তার নিজস্ব বৈধতার ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয় সে বেআইনি এবং বাতিল করে দিতে পারে। মোটকথা, একটি ধর্মের ফুল কনসেপ্ট সেক্যুলারিজমে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বলতে হবে, সেক্যুলারিজম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং;সে নিজেই একটি ধর্ম।

মূলত পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই যেকোনো একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। এই অর্থে যারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করে, তারা যেন সমস্ত উসুল থেকে বেরিয়ে শূন্যে অবস্থান করছে! এটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই না। দুনিয়ার এমন কোনো অবস্থান নেই, যা নিরপেক্ষ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কেউ বলল, 'আমি অমুক বিষয়ে মুসলিম না হয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে চিন্তা করব'। এমন মন্তব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা। ইসলামের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সে তো কুফুরি অবস্থান গ্রহণ করছে। সেটা আবার নিরপেক্ষ হয় কীভাবে! ইসলামের বাইরে যাওয়ার অর্থই হলো কুফুরি গ্রহণ করা। আর কুফর স্বয়ং একপাক্ষিক অবস্থান। ঈমান ও কুফুরের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই। ইমামগণ বহু আগেই এই অবস্থান নাকচ করে গেছেন। (মাকালাতে তাফহিমে মাগরিব-১০৬)

'আবদিয়্যাত'থেকে বেরিয়ে মানুষ কখনো নিরপেক্ষ হয় না। বরং সে খায়েশ এবং শয়তানের গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَاِنْ لَّمْ يَستَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اهْوَآءَهُم.وَمَن اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ.اِنَّ اللَّهِ لا يَهدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ

অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানাবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (সূরা কাসাস, আয়াত-৫০)

সুতরাং ইসলামে যেমন কোনো নিরপেক্ষতা নেই। হয়তো ইসলাম নয়তো কুফর। কোনো মুসলমান সেক্যুলারিজম গ্রহণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি ইসলামি রাষ্ট্রে সব মতের লোক সমান অধিকার পায় না,কোনো কাফের মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো পদ লাভ করতে পারে না। সেক্যুলারিজম ও এর ব্যতিক্রম নয়। কার্যত কোনো মুসলিম সেক্যুলার রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য তাকে সেক্যুলার হতে হয়। কুরআন-সুন্নাহর উপর সেক্যুলার সংবিধান কে প্রাধান্য দিতে হয় তাকে। এই শপথ না করে সে কোনো পদ লাভ করতে পারবেনা।

সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থা তার সেক্যুলারিজম নামক ধর্মে বিশ্বাসী নাগরিকদের বাইরে অন্য নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, তার বসবাসের অধিকারই মেনে নেয় না। হয়তো তাকে হত্যা করে কিংবা বন্দি করে। সুতরাং সেক্যুলারিজম কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। তা কখনো সব মত ও পন্থাকে সম-অধিকারও প্রদান করে না। সুতরাং মুসলিমদের জন্য সেক্যুলারিজম কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না;যেহেতু এটা প্রথমেই আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করে।

আমাদের উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিক হোক কিংবা ফলগত,কোনো দিকই ইসলামসম্মত নয়। শরিয়ত উভয় দিকই প্রত্যাখ্যান করে।

ইসলামি শরিয়াহর উৎস:

১. আল কুরআনুল কারীম:

ইসলামী শরিয়াহ এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল কুরআনুল কারীম। এটি قرأ ক্রিয়ার মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ:জমা করা, একত্র করা। অতএব, القراءة অর্থ: এক হরফের সাথে আরেক হরফ মিলানো। আল কুরআন কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ কিতাব নামে খাস করা হয়েছে। ফলে কুরআন কে কিতাব বলা হয়।এটি পূর্ববর্তী কিতাব গুলোর পূণাঙ্গ সারমর্ম স্বরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন- " আর স্বরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে,তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষী রূপে হাযির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা,হিদায়াত,রহমত ও মুসলিমদের জন্য সংবাদস্বরূপ"। (সুরা আন-নাহল:৮৯)

আল-কুরআন হলো দ্বীনের মূলভিত্তি, ইসলামী শরিয়াহর মূল উৎস, সর্বযুগে ও সর্ব দেশে এটি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল।

২.সুন্নাহ ও শরিয়াহ আইনের অবস্থান:

সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ পথ, পদ্ধতি ও জীবন চরিত;চাই তা প্রশংসনীয় হোক বা নিন্দনীয়। এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে ও হাদিসে এ অর্থে এসেছে। যেমন: আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

"তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।"(সুরা আল-ইসরা:৭৭)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, তাঁর সাধারণ গুনাবলী বা তাঁর জীবন চরিত্র হাদীস বলে।

মুলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শরীয়াহ বিধান বা রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার কার্যে যা কিছু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে, চাই তা তাঁর কথা বা কাজ বা যৌন সমর্থন যাই হোক এবং তা আমাদের পর্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের জন্য দলিল ও শরিয়াহর মূলভিত্তি হিসেবে ধর্তব্য হবে।

মুজতাহিদগণ এ থেকে শর'ঈ বিধি বিধান ও বান্দাহর আদেশ নিষেধ উদ্ভাবন করবেন।

৩.আল-ইজমা:

ইজমা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো এক যুগে শরিয়তের কোনো এক বিধানের উপর একমত হওয়া। মুসলমানগণ একমত যে, 'ইজমা' শরিয়াহ এর দলিল, প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজমা' দলিল হওয়ার প্রমাণ: আল-কুরআনে এসেছে:

"কারো নিকট হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে,তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। "(সুরা আন-নাহল:১১৫)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মত ভুলের উপর একমত হবে না।" আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তিনি যেন আমার উম্মত কে ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত না করেন। ফলে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। তাই যে জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চায় সে যেনো জামা'আতের সাথে থাকে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি কে ছিন্ন করল।"(আত-তিরমিযী:২০৯৩)

৪.আল-কিয়াস:

কিয়াস হচ্ছে কোনো বিষয়ের জন্য সে বিধান স্পষ্ট ভাবে অন্য একটি বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদিস বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কারী 'ইল্লাত' বা হেতু থাকার কারণে অধিকাংশ ফিকহবিদগণ একমত যে, কিয়াস শরীয়তের দলিল, এর দ্বারা আহকাম সাব্যস্ত করা হয়।

ইসলামি শরিয়াহ ও মানবীয় আইনের মধ্যে পার্থক্য:

ইসলামি শরিয়াহ:

- ইসলামি শরিয়াহ আল্লাহ প্রদত্ত।
- উৎস:কুরআন ও সুন্নাহ।
- দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ লাভ।
- উদ্দেশ্য: আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ গঠন।
- সদা সর্বত্র উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য।
- শাশ্বত, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ।
- আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব।
- অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:আল্লাহভীতি-নৈতিক চেতনা-দন্ড।

মানবীয় আইন:

- মানব রচিত।
- উৎস:সমাজ ও গোষ্ঠীর আচরণ।
- পার্থিব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা।
- উদ্দেশ্য:প্রচলিত সমাজের প্রয়োজন পূরণ।
- স্থান, কাল পাত্র ভেদে উপযোগী।
- পরিবর্তনশীল, জাতি গোষ্ঠী শ্রেনীগত, অপূর্ণাঙ্গ।
- রাষ্ট্র/জনগণ/বিচারক/শাসকের কর্তৃত্ব।
- অগ্রগতির সাথে পরিবর্তনশীল
- দন্ড।

ইসলামি শরিয়াহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন:

ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে। সে কথাগুলো হলো:

১.ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে একদিকে যেমন রয়েছে ঈমানিয়াতের(অর্থাৎ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির) বিষয়সমূহ, তেমনি এতে রয়েছে আমল, ইবাদত ও মুয়ামালাতের(অর্থাৎ কর্ম, ইবাদত ও পারস্পরিক আচরণের) বিষয়াদি। এই শেষোক্ত বিষয়গুলোই শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

২.সুতরাং প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি শুধু শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং বাস্তবায়নের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত।

৩.ইসলাম বাস্তবায়নের বিষয়টি কারো খেয়াল খুশি মতো হবে না। এক্ষেত্রে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে। আল্লাহর তত্ত্বাবধানে তিনি যে প্রক্রিয়ায় দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেটাই দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের একমাত্র পন্থা।

শরিয়ার গুরুত্ব ও অখন্ডতা

ইসলামি শরিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

اِتَّبِعُوا مَا في أُنزِلَ اِلَيكُم مِّن رَّبِّكُم وَلَا تَتَّبِعُوا من دُونِهِ اَولِيَاءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ:তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা (যে বিধান)নাযিল করা হয়েছে তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো, তাঁকে ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়ে তাদের অনুসরণ করানো। তবে তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সুরা আল আরাফ: আয়াত ৩)

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا ان يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ من اَمْرِهِمْ.

অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রসুল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন, তখন আর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কোনো মুমিন পুরুষ বা নরীর নেই। (সুরা আল মায়িদা:আয়াত ৩৬)

শরিয়া ছাড়া ইসলাম পরিপালন করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন:নামায,রোযা,হজ্জ,যাকাত,বিচার,অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামি শরিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল আইন। আল্লাহর আইন পালনের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে কোনো প্রকার ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। ইচ্ছা মাফিক বা সুবিধা মাফিক কিছু অংশ পালন করার এবং কিছু অংশ পালন না করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা কাউকে দেননি। মহান আল্লাহ বলেন-

‘তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অমান্য করবে?তোমাদের মধ্যে যারাই এমন টি করবে তাদের একমাত্র পরিণাম হবে পৃথিবীর জীবনে হীনতা আর লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিনতম আযাবে।আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনবহিত নন।’(সূরা বাকারার:আয়াত ৮৫)

ইসলাম কেনো সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রত্যাখ্যান করে?

সেক্যুলারিজম (ধর্মহীনতা) যা আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নামে প্রসিদ্ধ তা মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে উপেক্ষা করে। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের দেহের চাহিদা পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু আত্মার চাহিদার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না।

-পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ মতবাদটির উৎপত্তি হয়েছে। আমরা প্রাচ্যবাসীদের নিকট এটি একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা অচেনা চিন্তাধারা বৈ কিছু নয়।

-ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলে। যার ফলে ব্যক্তিতন্ত্র, জাতভেদ তথা উঁচুনীচু বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, মতবাদভিত্তিক বিভেদ , গোত্রীয় বিভেদ, জাতীয়তা ভিত্তিক বিভেদ, দলাদলি, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদির উন্মেষ ঘটে।

-এই মতবাদ নাস্তিকতা,সমকামিতা, পাশবিকতা, বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতি, প্রজন্মের বিনাশ ইত্যাদির প্রসার ঘটায়।

-ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদেরকে পাশ্চাত্যের বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে। যার ফলে আমরা নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিন্দা করব না। আমরা মুসলিম সমাজের স্বভাব-চরিতকে ভুলুণ্ঠিত করব এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজের রুদ্ধদারকে খুলে দেব। ধর্মনিরপেক্ষতা সুদী কারবারের বৈধতা দেয় এবং সিনেমা, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি শিল্প হিসেবে অতি মর্যাদা দেয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়াতলে প্রত্যেক মানুষ অন্যের ক্ষতি করে হলেও নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালায়।

-ধর্মনিরপেক্ষতা পাশ্চাত্য সমাজের সমস্যাগুলো আমাদের সমাজে টেনে আনে। যেমন পরকালের হিসাবনিকাশ কে অস্বীকার করা। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ধর্মীয় ভাবধারার বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক রিপু যেমন-লোভলালসা, ব্যক্তিস্বার্থ, অস্তিত্বের লড়াই ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবন যাপন করে;সেখানে আত্মার বিবেচনা একেবারে শূণ্য।

-ধর্মনিরপেক্ষতা বিকাশ ঘটলে জাগতিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়;যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর। গায়েবী বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করা হয়। যেমন আল্লাহর উপর ঈমান, পূণরুত্থান, পাপ ও পূণ্য। এর ফলে এমন এক সমাজের উদ্ভব ঘটে যে সমাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে-দুনিয়ার ভোগ ও সস্তা সব খেল তামাশা।

উপসংহার:

পূর্বের আলোচনা থেকে এই কথা পরিষ্কার যে-রাষ্ট্রীয় জীবন ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বহিষ্কার করে জাগতিক জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আহবানই ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতে, ধর্ম মানুষের মনের খাঁচায় বন্দি থাকবে, খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে ধর্মকে প্রকাশ করা যাবে। অথচ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তকে আইন হিসেবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে সে নিষিদ্ধ করে না-সে মুরতাদ, সে মুসলিম নয়। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার যুক্তি খন্ডন করা ও তাকে তওবা করার আহবান জানানো ওয়াজিব-যেন সে ইসলামে ফিরে আসার সুযোগ পায়। অন্যথায় ইহকাল ও পরকালে তার ব্যাপারে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে।

রেফারেন্স:

*সেক্যুলারিজম কি
*ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি ও উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব,
আরব ও ইসলামি বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা,
*সেক্যুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসবলী,
*সেক্যুলারিজম কি মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য,
*সেক্যুলার মতবাদের আদর্শিক ও বিশ্বাসগত শেকড় (ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামবাদ বই থেকে) ।
*সেক্যুলারিজম নিরপেক্ষতা না;বরং ভিন্নমতের দমন,
*শূন্যগর্ভ সেক্যুলারিজম(সংশয়বাদ বই থেকে)
*রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা,
*ক্যারিয়ারে সেক্যুলার(অবাধ্যতার ইতিহাস বই থেকে) ।
*ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা,
*টলারেন্সের ইসলামিকরণ(হিউম্যান বিয়িং বই থেকে) ।

*ইসলামি শরিয়াহ ও মানবীয় আইনের মধ্যে পার্থক্য,
*ইসলামি শরিয়াহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন,
*শরিয়ার গুরুত্ব ও অখন্ডতা(ইসলামি শরিয়াহ কী কেনো কিভাবে বই থেকে) ।
*ইসলাম কেনো সেক্যুলারিজম
(ধর্মনিরপেক্ষতা) প্রত্যাখ্যান করে? (ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামবাদ বই থেকে) ।